সামাজিক শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নে ধর্মকর্ম

বিগত ১৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখের লেখাটি ভুলবশত ‘ধর্মীয় শিক্ষাকে কর্মমুখী করতে হবে’ শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। এ নিয়ে পাঠকসমাজের অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেছেন, ‘ধর্মীয় শিক্ষাকে আবার কর্মমুখী করা যায় কীভাবে’? আসলে শিরোনামটা ‘ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে কর্মমুখী করতে হবে’ লিখলে ভালো হতো।

এদেশের মানুষ কম-বেশি ধর্মভীরু। সেই আদিকাল থেকে এ দেশের সমাজব্যবস্থায় ধর্মীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। মানুষের চিন্তা-চেতনা, কর্ম ও সংস্কৃতির সাথে ধর্মীয় মূল্যবোধ ওতোপ্রতভাবে জড়িত। তাই সমাজব্যবস্থার প্রতিটা কর্ম, শিক্ষা ও সিস্টেম ডেভেলপমেন্টে ধর্মীয় উপাদানের সার্থক প্রয়োগ কর্ম, প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থার সফলতা অনেকটাই নির্ভরশীল।

এ দেশের প্রতিটা আস্তিক মানুষ ইহকাল ও পরকালকে নিয়ে ভাবেন– কেউ বেশি, কেউ কম। জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে চান। আস্তিক ধর্ম-উদাসী মানুষকে নিয়ে বেশি অসুবিধা হয় না; যা বোঝানো যায়, তাই বোঝেন। ধর্মজ্ঞান তাদের কম। কিন্তু অনেক ধর্মভীরু মৌলবি-মাওলানাদের কাছেই সৃষ্টি, সমাজব্যবস্থা ও জীবনের উদ্দেশ্যটা পরিস্কার না। আবার বর্তমান সমাজে ভালো কাজ ও ভালো কথা বলার লোকের বড্ড অভাব দেখা দিয়েছে। সমাজ ও দেশ পরিচালকরা তাদের চিন্তা ও কর্মব্যবস্থা দিয়ে সমাজকে বুনো আবহের দিকে সজোরে টানছেন। মাথায় আঘাত করে টাকের যত্ন নেওয়ার বিজ্ঞাপনে পারদর্শিতা দেখাচ্ছেন। মানুষের মানবিক বৈশিষ্ট্যের ভাণ্ডারে আজ টান পড়েছে। মৌলবি-মাওলানারা জীবনের উদ্দেশ্যকে পরকালের জন্য নামাজ, রোজা ও হজের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে অনেকটাই আবদ্ধ করে ফেলেছেন। এ-সবের প্রভাব আমাদের দুনিয়াদারি, সমাজব্যবস্থা ও সমাজকর্মের উপর পড়েছে। তাদের অনেকেই ইহকালের সামগ্রীক শিক্ষা (অল ইনক্লুসিভ শিক্ষা) ও কর্মজীবন অলীক-অসার ভেবে শুধু পরকালের কল্যাণকে সুনিশ্চিত করতে চান এবং সমাজে তা প্রচার করেন। ইহকালের কল্যাণ কীসে, ইহকালের কল্যাণ ছাড়া যে পরকালের কল্যাণ সম্ভব নয়– তা তাদের বুঝে আসে না। পরকালের কল্যাণ কী প্রক্রিয়ায় অর্জিত হয় তাও তারা ভাবতে নারাজ। তারা নামাজ, রোজা, হজের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে বেহেশত যাবার সোজা-সাপটা পথ খুঁজে বের করার বুদ্ধি করে ফেলেছেন। সেমতো মানুষকে কর্মহীন শিক্ষা ও কর্মহীন জীবনের দিকে ধর্মীয় আবেগ দিয়ে টানেন। কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা না করে, না বুঝে, নির্দেশনা মোতাবেক কর্ম না করে পরকাল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কুরআনের ইহকালীন কর্মজীবনের সামাজিক বিশ্লেষণ না করে শুধু বেহেশতমুখী ব্যাখ্যা দেন। হক্কুল্লাকে বোঝেন, হক্কুল ইবাদকে বোঝেন না। পরিবার, সমাজ ও মানবসেবা হলো হক্কুল ইবাদের অন্যতম দিক– এ নিয়ে অনেকে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিতেও অপারগ। জীবনকর্মকে উপেক্ষা করে শুধু বিশ্বাসের উপর ভর করে পরকালের কল্যাণ কামনা করেন। আংশিক, অগভীর শিক্ষা ও ধর্মদর্শন, সৃষ্টিদর্শন বোঝার অক্ষমতা, কুরআন বিশ্লেষণের অক্ষমতা– এর জন্য দায়ী। বলা হয়েছে, ‘তবে কি তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না, না তাদের অন্তরে তালা পড়ে গিয়েছে?’ (মুহাম্মাদ, ৪৭:২৪)। কুরআন বোঝার মতো উচ্চশিক্ষা নেই, সামাজিক বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান নেই, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আত্মজিজ্ঞাসা নেই, অনুভূতি নেই; মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানা নেই, চিন্তা-গবেষণার সক্ষমতাও নেই। ধর্মীয় শিক্ষা কর্মজীবন ও সমাজজীবনে প্রয়োগ নেই। ফলে আমাদের সুষ্ঠু সমাজ গঠন, সামাজিক সুশিক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন ব্যহত হচ্ছে। কুরআনের অসংখ্য বর্ণনা যে খোদা নির্দেশিত পথে ইহকালীন কাজ-কর্ম ও চিন্তা-চেতনা– তা আমরা এড়িয়ে যায়। কুরআনের সামান্য অংশ জুড়ে পরকাল, আর অধিকাংশ বিষয়ই যে ইহকালীন সৃষ্টি-জগৎ, নির্দেশিত কাজ, পথ ও পাথেয়। সেটা আমরা বেমালুম ভুলে বসে আছি।

মূলত কোরআন দুটো কাল বা সময়কে নিয়ে সবিস্তার আলোচনা ও ব্যাখ্যা করে– ইহকাল এবং পরকাল। ইহকালের পুরোটাই কর্মজগৎ ও চিন্তাজগৎ। ইহকালের সৃষ্টিজগৎ, জীবন ও জীবনকর্ম পুরোটাই বিজ্ঞান। বিজ্ঞান আছে বলেই মানুষ ইহলোকে টিকে আছে। মানুষের জন্ম প্রক্রিয়াটা বিজ্ঞান। মানব দেহ, দেহের কার্যপ্রণালি, কোষ, রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয় প্রভৃতি সবটুকুই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। খাবার গ্রহণের মাধ্যমে বেঁচে থাকা বিজ্ঞান। প্রাণি ও উদ্ভিদের পারস্পরিক বেঁচে-থাকা ও নির্ভরশীলতার সবটাই স্রষ্টার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। পরকালের পুরোটাই ইহকালীন কর্ম ও চিন্তাধারার ফল পাবার জন্য পরকালের কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস (মেটাফিজিক্স)। অথচ আমাদের মৌলবি-মাওলানারা বিজ্ঞান পড়েন না, বোঝেনও না, বুঝতে চানও না। বিজ্ঞানের অবদান ছাড়া জীবন পরিচালনা অসম্ভব, এটা ভেবে সেমতো কাজ করেন না। সৃষ্টিদর্শন ও জীবনদর্শন নিয়ে ভাবেন না। দুনিয়াদারি জীবন-পেশা-কর্মব্যবস্থা বুঝতে চান না। না-জেনে না-বুঝেই ইসলাম ধর্ম প্রচারে ব্রতী হন, সৃষ্টি ও কর্মপ্রণালীর সোজা-সাপটা উপরিগত মুখস্ত ব্যাখ্যা দেন। দুনিয়ার জীবনযাপন ও কর্ম বাদ দিয়ে শুধু বিশ্বাসের উপর ভর করে, কখনো তসবিহ পড়ে পরোকালে ভালো প্রতিদান আশা করেন। সাধারণ মানুষকে সে-ভাবে চালান। ইসলামকে শুধু পরকালের জন্য ইবাদত-বন্দেগির আনুষ্ঠানিক গণ্ডিতে আবদ্ধ করে ফেলেন। এটা বাস্তবসম্মত নয়। এখানেই সমাজের দুর্গতি। তাই বলতে হয়, কোরআনে বর্ণিত সমগ্র সৃষ্টিজগৎ ও এর কর্মপ্রণালীর সবটুকুই ধর্মের অন্তর্গত- এই সামুদয়িক (অল ইনক্লুসিভ) ব্যাখ্যা যতক্ষণ ধর্মকে নিয়ে না দিতে পারি এবং ধর্মশিক্ষার আওতা কোরআনে উল্লেখিত সমুদয় সৃষ্টি, জীবন ও কর্মপ্রণালি এবং এর ভালো-মন্দ সম্পর্কীত সকল বিষয়ের শিক্ষা (অল ইনক্লুসিভ শিক্ষা) বলে গ্রহণ করতে না পারি এবং সেমতো কর্ম করতে না পারি, ততক্ষণ 'ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান' বললে চিন্তা, কথা ও কাজে গরমিল ধরা পড়ে। এটা কোনোমতেই কাম্য নয়। আমরা এদেশের মাদ্রাসা শিক্ষায় সকল পেশাজীবী তৈরির শিক্ষা, সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও দুনিয়ার সকল শিক্ষা-কর্মকে বাদ দিয়ে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা ও সে বিষয়ে মাসআলা-মাসায়েল শিখি, পরকালে সফলকাম হতে চেষ্ঠা করি– এটাও অবাস্তব ও অবান্তর। স্রষ্টার দেখানো পথে দুনিয়ার সকল চিন্তা, পেশা ও কর্মই ধর্ম ও ইবাদত। পরকালে কোনো ধর্ম নেই, কর্মও নেই, ইবাদতও নেই; শুধু ফলাফল প্রাপ্তি এবং অনন্ত জীবনযাপন।

আমি সামাজিক শিক্ষা, সমাজগঠন ও সমাজকর্ম, সৃষ্টিসেবা নিয়ে বলতে গিয়ে বিষয়টাকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পরিষ্কার করতে চাই। এদেশকে গড়তে, উন্নয়নের প্রেক্ষাপট রচনা করতে ও এদেশকে এগিয়ে নিতে গেলে এদেশের অধিকাংশ মানুষের ধর্মবিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ চিন্তা, শিক্ষা ও কর্মব্যবস্থাকে বেছে নিতে চাই। জীবনবিমুখ, কর্মবিমুখ ও পেশা/বৃত্তিবিমুখ শিক্ষা থেকে বেরিয়ে আসতে চাই। ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াও সৃষ্টিসেবার উদ্দেশ্যে জীবনের কর্মে ও সমাজের কর্মব্যবস্থায় ধর্মের প্রায়োগিকতা দেখতে চাই। ইহকালীন জীবনযাপন, পেশা/বৃত্তিমূলক-ব্যবসায় শিক্ষা, সমাজগঠন, সমাজকর্ম, সমাজসেবা, সমস্ত ন্যায় কাজ ও কল্যাণের মধ্যে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার মধ্যে পরকালের কল্যাণ ও মুক্তির পথ খুঁজবে এমন জনগোষ্ঠী পেতে চাই। তাদেরকে 'ধর্মই কর্ম' বা 'কর্মই ধর্ম' (সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে)– এই নীতিতে বিশ্বাসী পেতে চাই। তারা যে কোনো ধর্মের হতে পারে বা সম্মিলিত মানব গোষ্ঠীর হতে পারে। এজন্য আমি অতি সংক্ষেপে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, ধর্মের আওতা, শিক্ষার আওতা, মানব কল্যাণ, মানুষের কর্ম-পেশা, আমল, ইবাদত (দৈনন্দিন জীবনে ও সব কাজ-কর্মে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সকল চিন্তা ও কাজ করা) বিষয়গুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে কিছু বলছি, যাতে ইহকালীন কর্মজীবন, শিক্ষা ও চিন্তাধারাই যে পরকালের মুক্তির পথকে নিরূপিত করে– তা পরিষ্কার হয়।

আমি ইন্টারনেট ঘেটে দেখলাম, ইসলামি স্কলারদের লেখাপড়ার মান ভালো। সৃষ্টিদর্শন, সমাজদর্শন ও কর্মদর্শন বিষয়ে তাদের দিক নির্দেশনা ও লেখালেখি নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা অন্য জায়গায়–

তাদের লেখালেখি, বিশ্লেষণ সাধারণ মানুষ পড়েন না, জানেনও না। এরা সাধারণ মানুষের ধরা-ছাঁয়ার বাইরে রয়ে যান। সাধারণ মৌলবি-মাওলানারা সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে আছেন। এদের গৎবাঁধা ধর্মীয় কথা সমাজের মানুষ মেনে চলেন। দীর্ঘদিন শুনতে শুনতে ও মানতে মানতে সমাজের অভ্যন্তরে কিছু বিষয়ের উপলব্ধি ও অনুভূতি বিশেষ মনজাগতিক আবেগময় রূপ পেয়েছে। ফলে নির্মোহ-বাস্তবমুখী চিন্তাধারার গলদটা রয়ে গেছে। আমরা ইসলাম ধর্মের শিক্ষা, কর্ম ও ভাবনার গণ্ডি এই উপমহাদেশে সংকীর্ণ করে ফেলেছি। আমরা ধর্মের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ইসলামি পারিভাষিক অনেক শব্দ ধর্মীয় আবেগ মিশিয়ে ভাবতরঙ্গ তৈরি করি, ক্ষুদ্র গণ্ডিতে ব্যবহার করি এবং মনের মধ্যে সেভাবে উপলব্ধি করি, যদিও এসব শব্দের আওতা ব্যাপক; মানুষের সাধারণ কাজ-কর্ম ও চিন্তা-চেতনার সাথেও সম্পৃক্ত। এসব শব্দ আমাদের মনে শুধু ধর্মের বিষয়ে গেঁথে-যাওয়া আলাদা দ্যোতনা সৃষ্টি করে। ফলে আমরা বাস্তব জীবনে শব্দগুলো প্রয়োগ করতে পারিনে। শব্দগুলো দিয়ে আমরা বাস্তব জীবনের কিছু বুঝিওনে। সেমতো চলতে পারিনে, কাজও করতে পারিনে। সমস্যাটা আমাদের ধর্মের প্রতিভূদের (প্রতিনিধিদের) ভাবনার গণ্ডি নিয়ে। তারা ইসলাম ধর্মের সংকীর্ণ ব্যাখ্যা দিয়ে শুধু ক্ষান্তই হননি, বক্তৃতায় ভাবের আবেশ মিশিয়ে সুর করে কথা বলে আবেগাপ্লুত মুসলমানদেরকে কল্পনার জগতে ইহলোকেই বেহেশতের স্বাদ গ্রহণ করান। ইহকালের পথ ও পাথেয় এবং কর্মজীবন নিয়ে আলোচনা কম করেন। সংক্ষিপ্ত পথে বেহেশতে যাবার নুসকা (ব্যবস্থাপত্র) বাতলান। ধর্ম মানে যে ইহকালীন কর্মবিধান ও চিন্তা-চেতনা তা উপেক্ষা করেন। কথায় কথায় ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে ফতোয়া জারি করেন। তারা কুরআনের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা ছেড়েছেন। ব্যর্থ হয়েছেন কুরআন-হাদিসের দৈনন্দিন কর্মজীবনে ও সমাজজীবনে প্রায়োগিক ব্যাখ্যা দিতে। অথচ কুরআন নিজেই নিজেকে 'বিজ্ঞানময় কুরআন' বলে ঘোষণা দিয়েছে। বলা হয়, কুরআনে মোট আয়াত সংখ্যার মধ্যে প্রায় এক-অষ্টমাংশই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয় আলোচিত হয়েছে। আমার মনে হয়, আমাদের আলেম-ওলামাদের বিজ্ঞান, সৃষ্টিজগৎ, কর্মজীবন, পেশা, পথ ও পাথেয় বিষয়ে শিক্ষায় আরো মনোযোগী হতে হবে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ বিষয়গুলো প্রচার করতে হবে। তার আগে তাদের ধর্মের সামাজিক ব্যবহার ও কর্মজগৎ, সৃষ্টিদর্শন নিয়ে ব্যাপক পড়াশোনা করতে হবে। তাদের নিজেদের ভালোর জন্য সকল শ্রেণির মাদ্রাসার পাঠ্যসূচিতে ধর্মের সকল কর্মভিত্তিক প্রায়োগিক শিক্ষা আনতে হবে; পাঠ্যসূচিতে বিজ্ঞান-ব্যবসা শিক্ষার প্রচলন করতে হবে। সমাজজীবনে ও জীবনযাপনে ধর্মের প্রায়োগিক দিকের প্রচার করতে হবে। সৃষ্টিদর্শন ও কর্মদর্শন বুঝতে হবে; নিজেদের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনতে হবে। নিজেদেরকে সংশোধন করতে হবে। তাদের অগভীর জ্ঞানকে অজ্ঞতাবশত জাহির করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বিভক্তি, দ্বন্দ্ব, হানাহানি, রাজনৈতিক দলবাজি বন্ধ করতে হবে। 'নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই' কথাটা গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় রাখতে হবে। সাধারণ মানুষের কুরআন-হাদিসের জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষা এবং এর সামাজিক বিশ্লেষণ শেখাতে হবে। এতে সমাজের ভোগবাদে আপদমস্তক নিমজ্জিত পথহারা মানুষ ও সাধারণ মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনুগামী সঠিক পথের সন্ধান পাবে। তারাও উন্নত জীবন ও সুশিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলার সহায়ক ভুমিকা পালন করতে পারবেন।

(২৯ অক্টোবর ২০২২, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; প্রাবন্ধিক ও গবেষক।